নৌমি গুরু বিবেকানন্দম্

স্বামী চেতনানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ একটি মহাবিস্ময়—a great wonder। তাঁর দিকে তাকালে ও তাঁর কথা শুনলে আমরা অবাক হয়ে যাই। ভাবি কী করে একজন মানুষের পক্ষে এক জীবনে এত করা সম্ভব। তিনি জন্মেছিলেন দেড়শো বছর আগে, পৃথিবীতে ছিলেন মাত্র ঊনচল্লিশ বছর পাঁচ মাস চব্বিশ দিন, আর কাজ করেছেন মাত্র সাত-আট বছর। তিনি কখনও বলতেন, ''আমি তিনশো বছরের পুরাতন পুরুষ।" আবার বলতেন, ''আমি নিজেকে বহু শতাব্দীর পর আবির্ভূত পুরুষ বলে অনুভব করছি।" জীবনের শেষে একদিন বলেন, ''যাক্, মৃত্যুই যদি হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম তা দেড় হাজার বছরের খোরাক।" ১৮৯৬ সালে লন্ডনে 'মায়া' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেন, ''আমেরিকাতে আমাকে বলত আমি যেন পাঁচ হাজার বছর পূর্বের কোনও অতীত বিলুপ্ত গ্রহ থেকে এসে বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি।" এসব কথা শুনলে মনে হয় তিনি ছিলেন কালজয়ী।

বেদান্তমতে ব্রহ্ম স্থান-কাল-কার্যকারণ সম্বন্ধের অতীত। স্বামীজী ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। সুতরাং তিনিও ব্রহ্মের মতো সব কিছুর ঊর্ধ্বে। স্বামীজী অতীতে ছিলেন, বর্তমানে আছেন ও ভবিষ্যতেও থাকবেন। স্বামীজী আমাদের কানে মন্ত্র না দিলেও প্রাণে মন্ত্র দিয়েছেন। তাই তিনি আমাদের প্রাণের গুরু—পরম গুরু। 'গু' মানে অন্ধকার, 'রু' মানে ধ্বংসকারী। এই অর্থে স্বামীজী আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। উপনিষদে আছে—একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি—আমি এক, আমি বহু হব। তাই ঈশ্বর প্রতি জীবের অন্তরে বিরাজ করছেন। স্বামীজী এক পত্রে লিখেছেন—''মার কৃপায় আমি একা এক লাখ হয়েছি। বিশ লাখ হব।" সত্যি বলতে কী, স্বামীজী এখন কোটি কোটি মানবের কল্পনার রাজ্যে, ভাবজগতে জীবন্তরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। তাই তাঁর এই দেড়শো বছরের শুভ জন্মতিথিলগ্নে আমরা সবাই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই—নৌমি গুরু বিবেকানন্দম্।

ভগবান 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' রূপে প্রকাশিত হন। স্বামীজী ছিলেন সত্যসংকল্প মহাপুরুষ, মানবকল্যাণকামী ও অতীব সুন্দর। মানবচক্ষু সর্বদা সুন্দরকে দেখতে ভালোবাসে। একটি আমেরিকান মেয়ে

বলেছিল, ''আমি রামকৃষ্ণের চেয়ে বেশি পছন্দ করি বিবেকানন্দকে। কারণ Vivekananda is handsome—খুব সুন্দর।" স্বামীজী সম্পর্কে যাঁরা স্মৃতিকথা লিখেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই স্বামীজীর অপরূপ রূপ ও সম্মোহক চক্ষুর বর্ণনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে বলেছিলেন—তোর চোখ শুদ্ধ জ্ঞানীর চোখ নয়, প্রেমিক ভক্তের চোখ। বাইরে তিনি ছিলেন মায়াহীন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল উপচে-পড়া ভক্তি ও ভালবাসার প্রস্রবণ। স্বামীজী ঠাকুরের আরাত্রিক স্তোত্রে উল্লেখ করেছেন—জ্ঞানাঞ্জন বিমলনয়ন বীক্ষণে মোহ যায়। এ-উক্তি তাঁর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। স্বামীজীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনের মোহ, মালিন্য, দুর্বলতা দূর হয়ে যায়।

ঈশ্বর বা মহাপুরুষদের চিন্তা করলে চোখ দিয়ে একটা স্নিগ্ধ জ্যোতি বেরোয়, মুখ কমনীয় হয়। তেমনি কুচিন্তা করলে মুখে কালো ছাপ পড়ে ও চোখ ঘোলাটে হয়। যোগশাস্ত্রে ত্রাটক বা চাক্ষুষী বিদ্যার উল্লেখ আছে। যোগীরা তন্ময় হয়ে কোনও সুন্দর মূর্তি বা দৃশ্যের উপর নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে দৃক্‌শক্তি বাড়িয়ে মনের চঞ্চলতা দূর করেন।

১৯৬৩ সালে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসবের সময় এক ভক্তের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি অদ্বৈত আশ্রম থেকে স্বামীজীর একাত্তরটি ছবি কিনে বাঁধিয়ে ঘরে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, ''আমি বৃদ্ধ, বসে ধ্যানজপ করতে পারি না। তাই স্বামীজীর প্রতিটি ছবির সামনে এক মিনিট করে দাঁড়াই। তাঁকে দেখি ও চিন্তা করি। এভাবে আমার একাত্তর মিনিট ধ্যান হয়ে যায়।" ধন্য ভক্ত।

স্বামী নির্লেপানন্দ লিখেছেন, ''স্বামীজী একদিন বলরাম বসুর বাড়িতে স্নান করছিলেন। জনৈক কলেজের যুবক তাঁকে বলেন, 'মশাই, আপনার পায়ের muscle গুলো তো বড় সুন্দর!' স্বামীজী অতি সহজভাবে উত্তর দিলেন, 'হাঁ রে, তা হবে না? ঠাকুর যে আমাকে দেখতে বড় ভালবাসতেন।'

''স্বামীজীর সবটাই সুন্দর। তাঁর ঠাট্টা সুন্দর। বেলুড় মঠে বাঁধানো প্রশস্ত চাতালে, বিস্তীর্ণ মাঠে কুকুর, ছাগল, হরিণ নিয়ে খেলা ও ছুটোছুটি সুন্দর। গোরুর গায়ে হাত বুলানো—এমনকী শুধু শুধু পায়চারি করে ঘুরে বেড়ানো—সবই সুন্দর।... তাঁর রূপ সুন্দর, গুণ সুন্দর, কথন সুন্দর। চলন সুন্দর। ধ্যান সুন্দর। কর্মপ্রচেষ্টা সুন্দর। গান সুন্দর। বাজনা সুন্দর। হাসি সুন্দর। কান্না সুন্দর। দুঃস্থের প্রতি সমবেদনা সুন্দর। মুখমণ্ডলে জীবের প্রতি করুণার আভা অতীব মনোহর। কখন কখন বকুনি—বড়ই 'পিলে চমকানো'—বিষম বিপদ। কিন্তু তারপর, কাছে ডেকে খাবার জিনিস দেওয়া, ভালবাসার প্রকাশ সুমধুর।"[১] 'মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্'—স্বামীজীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বামীজীর ভক্ত ও সেক্রেটারি ছিলেন মিসেস হ্যান্সব্রো। স্বামীজী তাঁকে কখনও বকেছেন কি না এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ''নিশ্চয়ই, বহুবার। তিনি আমার কাজের ত্রুটি দেখলে অনেক সময় খুব রূঢ়ভাবে কথা বলতেন। কখনো বলতেন, 'মা আমার কাজের জন্য কতকগুলো নির্বোধ এনেছেন।' অথবা 'আমাকে কতকগুলো বোকার সঙ্গে থাকতে হবে।' তাঁর বকুনি দেওয়ার প্রিয় শব্দটি ছিল—'fool' (বোকা)। যদিও তিনি বলেছিলেন যে, তিনি কারও কাছে ক্ষমা চান না, কিন্তু বকুনি দিয়ে আমার কাছে এসে এমন শান্তভাবে মিষ্টিসুরে কথা বলতেন যে মনে হত তাঁর মুখ যেন মাখন ও মধুমাখা।...জিজ্ঞাসা করতেন, 'আপনি কী করছেন?' এতে মনে হত, তিনি তাঁর বকুনি সংশোধন করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলতেন, 'আমি যাদের ভালবাসি, তাদের বেশি গালি দিই।' আমি জানতাম, তিনি সখেদে দোষ স্বীকার করছেন।"[২]

গুরুগীতার গুরুবন্দনায় আছে :

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

—গুরুর মূর্তি ধ্যান করবে; গুরুর পাদপদ্ম পূজা করবে; গুরুবাক্য মন্ত্রের মতো পালন করবে; গুরুর কৃপাতেই মুক্তি হয়। এ-চারটি মহাবাক্যের আলোকে আমরা পরম গুরু বিবেকানন্দের বন্দনা করব।

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ

স্বামীজী ছিলেন সপ্তর্ষির ঋষি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বাণী বহন করবার জন্য তাঁকে পৃথিবীতে আনেন। তিনি বলতেন, ''নরেন্দ্র নররূপী নারায়ণ। ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।'' স্বামীজী এখন ধ্যানলোকে ধ্যানমগ্ন। এসব মহাপুরুষ মৃত্যুঞ্জয়। মানুষ কল্পনার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা এঁদের হৃদয়ে বহন করেন এবং জীবন্ত করে তোলেন। আর সাধারণ মানুষের মৃত্যু হলে কয়েকদিন হাহুতাশের পর লোকে তাকে ভুলে যায়।

স্বামীজীর দেহাবসানের পর মিসেস সেভিয়ার তাঁর গুরুর কাজের জন্য বহু বছর হিমালয়ের মায়াবতী আশ্রমে ছিলেন। মিস ম্যাকলাউড একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ''আপনার একঘেয়ে লাগে না?'' প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, ''আমি শুধু তাঁর (স্বামীজীর) কথা ভাবি।'' আর একদিন তিনি জনৈক সন্ন্যাসীকে বলেন, ''দেখো, আমি 'বিবেকানন্দ' নাম জপ করি।'' একেই বলে প্রকৃত ভালবাসা। আমরা যাকে ভালবাসি তাকে হৃদয়ে বহন করি।

আমরা স্বামীজীকে চর্মচক্ষে দেখিনি, তবে তাঁর বহু ছবি দেখেছি। বর্তমানে স্বামীজীর পঁচানব্বই খানা ছবি আছে। এসব ছবি দেখে আমাদের কৌতূহল জাগে—তিনি সত্যি দেখতে কেমন ছিলেন, যার ওপর আমরা ধ্যান করতে পারি? কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা আমাদের সাহায্য করবে।

স্বামী নির্লেপানন্দ লিখেছেন : ''যদি ভালো লাগে ত যুবক নায়ক নরেন্দ্রের চিত্র ধ্যানে ধরে দেখতে চেষ্টা করো। সেই মুণ্ডিত মস্তক, কৌপীনবান, সতেজ, সুন্দর, গৈরিকাভ, সুঠাম, নয়নাভিরাম তনু। সেই পদ্মপলাশ আঁখি—সরসিজনয়নং নমো পঙ্কজনয়নায়। সে আঁখির তুলনা হয় না। স্বামী সারদানন্দ একদিন মুগ্ধ হয়ে এইমাত্র বলে চুপ করেছিলেন—'সে যে কি চোখ—কি আর বলবো?' আবার বলতে ইচ্ছা হয়—'নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।/ নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥' একজন বলেন—স্বামীজী যখন বলরাম বাবুর হলঘরে ঘুমিয়ে থাকতেন, দেখেছি তখনও চোখ সবটা বুজতো না। পাতায় পাতায় কখনও জোড়া লেগে মুড়তো না। শিবনেত্র—সত্য সত্য।''[৩] স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : ''এক গণৎকার... নরেনের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের তলা ও তৎনিম্নস্থিত স্ফীত স্থানটি বিশেষ করিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'এই যুবকটির পায়ে শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি চারিটি চিহ্ন রহিয়াছে, ইহা প্রায় সাধারণ লোকের দেখা যায় না।'... নরেন্দ্রনাথের পা ছিল নাতি-হ্রস্ব, নাতি-দীর্ঘ এবং ঘোড়া পা বা খড়ম পা কিঞ্চিৎ ন্যূনভাবে ছিল। মোটকথা, অল্প পরিমাণে হাতী পা ও অল্প পরিমাণে ঘোড়া পা মিশ্রিত ছিল।

''নরেন্দ্রনাথের হাতের অঙ্গুলি বা নখের বিশেষ লক্ষণ ছিল। অঙ্গুলি গোড়া হইতে আসিয়া ডগার দিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছে। থ্যাবড়া বা প্যাটকা নখ নহে, ইংরাজিতে যাহাকে tapering finger বা বাংলায় যাহাকে চাঁপারকলি অঙ্গুলি বলে সেই প্রকার ছিল, কিন্তু মেয়েদের আঙুলের মত নয়। এইরূপ অঙ্গুলি যাহাদের হয় তাহাদের মনের ভাব চোস্ত কাটাগড়া তৈয়ারি অর্থাৎ দ্বিধাশূন্য নিশ্চয়াত্মিক।... নখ ছিল ঈষৎ রক্তবর্ণাভ বা জৌলুসযুক্ত এবং নখের মাথাটি অর্ধচন্দ্রাকার ছিল।... সংস্কৃতে এই নখকে 'নখমণি' বলিয়াছে।

''নরেন্দ্রনাথের পদবিক্ষেপ অতিদ্রুত বা

অতিশ্লথও ছিল না; যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষায় অতি দৃঢ় সুনিশ্চিতভাবে ভূপৃষ্ঠে পদবিক্ষেপ করিয়া চলিতেন।... নরেন্দ্রনাথ কোন সময় হর্ষিত হইলে বা বক্তৃতা দিবার কালে তিনি ডান হাতের অঙ্গুলি প্রথমে সংযত করিয়া হঠাৎ ছড়াইয়া ফেলিতেন এবং তাঁর মনে যেমন যেমন ভাব উঠিত, অঙ্গুলি-সঞ্চালনও তদনুরূপ হইত। ডান হাতের পর বাম হাতে ঠিক এইরূপ ভাবই দেখাইতেন। একটু বিশেষ উত্তেজিত হইলে উভয় হস্ত ও অঙ্গুলি দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতেন। নরেন্দ্রনাথের মনে যেরূপ ভাব উঠিত, তাহার অর্ধাংশ কথা দিয়া ও অপর অর্ধাংশ হস্ত, অঙ্গুলি ও মুখভঙ্গি দিয়া প্রকাশ করিতেন। এইজন্য আমেরিকানরা বলিত, 'He is an orator by divine right' অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত বাগ্মীশক্তি তাঁহার আছে।"[৪]

নিবেদিতা লিখেছেন : "স্বামীজী নিজের শারীরিক গঠনের মধ্যে তিনি তাঁর মোঙ্গলীয় সদৃশ চোয়ালের জন্য যারপরনাই গর্ব অনুভব করতেন। তিনি উহাকে 'বুলডগের লক্ষণ—কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়ার চিহ্ন' বলে জ্ঞান করতেন।"[৫]

নিবেদিতা বলেন : "Mr. Tata told me that when Swamiji was in Japan, everyone who saw him was immediately struck by his likeness to Buddha." [মি. টাটা আমাকে বলেছিলেন যে স্বামীজী যখন জাপানে তখন তাঁকে যে-কেউ দেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুদ্ধসদৃশ রূপ দেখে অবাক হয়ে গেছে।][৬]

ক্যালিফোর্নিয়ার টমাস অ্যালান বলেছেন : "স্বামীজীর রূপের তুলনা হয় না। তাঁর মুখ, হাত, পা, সব কিছুই ছিল সুন্দর। স্বামী ত্রিগুণাতীত পরে বলেছিলেন যে স্বামীজীর হাত মেয়েদের হাতের থেকেও কমনীয় ছিল। স্বামীজীর শরীরের রং রোজই পালটাত—কোনদিন একটু মলিন, আবার কোনদিন অতি উজ্জ্বল। তবে সব সময় তাঁর মুখে একটা golden glow (সোনালি আভা) দেখা যেত।"[৭]

রোমাঁ্যা রোলাঁ্যা প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে স্বামীজীর দেহের বর্ণনা শুনে লিখেছেন : "বিবেকানন্দের দেহ ছিল মল্লযোদ্ধার মতো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। তাহা রামকৃষ্ণের কোমল ও ক্ষীণদেহের ছিল ঠিক বিপরীত। বিবেকানন্দের ছিল সুদীর্ঘ দেহ (পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি) দেহের ওজন ১৭০ পাউন্ড। প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, সুদৃঢ় গঠন, কর্মিষ্ঠ পেশল বাহু, শ্যামল চিক্কণ ত্বক, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল, আর অপূর্ব আয়ত পল্লবভারে অবনত ঘনকৃষ্ণ দুটি চক্ষু। তাঁহার চক্ষু দেখিলে প্রাচীন সাহিত্যের সেই পদ্মপলাশের উপমা মনে পড়িত। বুদ্ধিতে, ব্যঞ্জনায়, পরিহাসে, করুণায় দৃপ্ত প্রখর ছিল সে চক্ষু; ভাবাবেগে ছিল তন্ময়; চেতনার গভীরে তাহা অবলীলায় অবগাহন করিত; রোষে হইয়া উঠিত অগ্নিবর্ষী; সে দৃষ্টির ইন্দ্রজাল হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার রাজকীয়তা; তিনি ছিলেন আজন্ম সম্রাট। কি ভারতবর্ষে, কি আমেরিকায়, কোথাও এমন কেহ তাঁহার পাশে আসেন নাই যিনি তাঁহার নিকট নতশির না হইয়াছেন।"[৮]

বেটি লেগেট বলেছিলেন : "আমি জীবনে দুজন প্রকৃত পুরুষ দেখেছি—একজন জার্মান সম্রাট কাইজার আর অপরজন স্বামী বিবেকানন্দ।"

উপরিউক্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনাগুলি থেকে গুরুরূপী বিবেকানন্দের ধ্যানে সহায়তা হবে। স্বামীজীর কেবল রূপ নয়, তাঁর জীবন ও বাণীর উপর যত ধ্যান হবে, তত আমাদের ভিতর আত্মশক্তি জাগবে। স্বামীজীর সাধন ও সংগ্রাম সম্বন্ধে নির্লেপানন্দ লিখেছেন :

"সেই শক্ত মাংসপেশী। সেই শতবাধা, দারিদ্র্য দুঃখ অনাহারে, দৃঢ় উপেক্ষা। সেই অতুল শ্রদ্ধা—

সেই অদ্বৈত বেদান্তে পূর্ণ নিষ্ঠা। যাঁরা দ্বিধা করছিলেন, বাড়ী ফিরে গিছলেন, তাঁদের দোরে দোরে গিয়ে ডেকে আনা—আশার বাণী শুনানো। আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়—সন্ন্যাস-জীবনে চিহ্নিতদের লওয়ানো। আদর্শে ও বিশ্বাসে হিমাচলের ন্যায় অটুট, অচল! বুকের শ্রদ্ধা দিয়ে বাসুকির মতো তাঁর আজ্ঞা—গুরুর ভার, শিরে বহন। পুরাণপ্রথিত গুরুভক্তি, গুরুবাক্যে বেদজ্ঞান—জীবনে নরেন্দ্র মূর্ত করলেন। ওয়া গুরুজীকী ফতে। গুরুর জয় হোক।"

পূজামূলং গুরোঃ পদম্

মানুষ দেবতা, গুরু ও ধর্মপ্রচারকদের পূজা করে—এটিই সনাতন রীতি। স্বামীজী ১৯০০ সালে ক্যালিফর্নিয়ার প্যাসাডেনাতে 'বৌদ্ধ ভারত' বক্তৃতাকালে বলেন : "আপনারা জানেন, হিন্দুরা মানুষ-পূজা করতে ভালবাসে। সেদিকে তাদের আগ্রহ ঐকান্তিক। যদি আপনারা কিছু দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন, তবে দেখতে পাবেন—আমাকেও বহু লোক পূজা করবে। যদি হিন্দুদের মধ্যে কেউ কোন ধর্মপ্রচার করে, তবে জীবিতকালেই তাঁকে তারা পূজা করতে শুরু করে।"[৯]

স্বামীজীর কথা আক্ষরিক সত্য। ১৮৯৮ সালে মঠ যখন নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে, শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী একদিন গুরু বিবেকানন্দের পাদপূজা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি সম্মত হলে শরৎবাবু কতকগুলি ধুতুরা ফুল এনে স্বামীজীর শরীরে মহাশিবের অধিষ্ঠান চিন্তা করে বিধিমতো পূজা করলেন।

পূজাশেষে স্বামীজী শিষ্যকে বলেন, "তোর পুজো তো হলো, কিন্তু বাবুরাম (প্রেমানন্দ) এসে তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে! তুই কিনা ঠাকুরের পুজোর বাসনে (পুষ্পপাত্রে) আমার পা রেখে পুজো করলি?" এমন সময় প্রেমানন্দ উপস্থিত হওয়ায় স্বামীজী তাঁকে বললেন, "ওরে, দেখ, আজ কি কাণ্ড করেছে!! ঠাকুরের পুজোর থালা বাসন চন্দন এনে ও আজ আমায় পুজো করেছে।" প্রেমানন্দ হেসে বললেন, "তা বেশ করেছে; তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন?"[১০]

স্বামীজীর শিষ্য অচলানন্দ লিখেছেন, "একদিন তিনি (স্বামীজী) গম্ভীর হয়ে [বেলুড়] মঠে ঠাকুরঘরের নিচে বসে আছেন আর পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি ঐদিক অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিলাম। আমাকে দেখে স্বামীজী বললেন, 'এই দিকে আয়। যা, ফুল তুলে নিয়ে আয়।' আমি ফুল তুলে আনলাম। পরে আমাকে বললেন, 'আমাকে পূজা কর—নিত্য পূজা করবি।' আবার বললেন, 'ফুল তুলে নিয়ে আয়।' ফুল তুলে আনার পর আমাকে বললেন, 'অধ্যক্ষের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) পূজা কর। গুরু আর অধ্যক্ষ এক—জানবি। নিত্য পূজা করবি।"[১১]

কী করে গুরুপূজা করতে হয় তা স্বামীজী দেখিয়ে গেছেন। স্বামী অচলানন্দের স্মৃতি : "একদিন দেখি পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের নিত্য পূজায় বসেছেন, এমন সময় স্বামীজী গিয়ে উপস্থিত। স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে উঠিয়ে... নিজেই পূজা করতে বসে গেলেন। এক-আধবার ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিয়েই নিজের মাথায় অর্ঘ্য দিতে আরম্ভ করলেন। তখনই আবার ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর আসন ত্যাগ করে ঠাকুরঘর হতে বাইরে আসবার সময় তাঁর কী এক অপূর্ব গদগদভাব। আমরা সকলে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম।"[১২]

স্বামীজীর পূজাপদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। মহাপুরুষ শিবানন্দ বলতেন—ধ্যানই ছিল স্বামীজীর পূজা। ধ্যানঘর থেকে যখন বেরুতেন, তখন তাঁর মুখ লাল হয়ে থাকত। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী বোধানন্দ স্বীয় গুরুর অপূর্ব পূজা সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেছেন :

''বেলুড় মঠে একদিন স্বামীজী বললেন যে, সেদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করবেন। আমরা সবাই স্বামীজীর পূজা দেখবার জন্য ঠাকুরঘরে গিয়ে বসলাম। স্বামীজীর আনুষ্ঠানিক পূজা দেখার জন্য আমাদের দারুণ কৌতূহল। স্বামীজী প্রথমে যথারীতি পূজার আসনে বসে ধ্যান শুরু করলেন। আমরাও ধ্যান করতে থাকলাম। বেশ কিছু সময় পরে আমার মনে হলো, কে যেন আমাদের চারপাশে ঘুরছেন। ব্যক্তিটি কে তা দেখবার জন্য আমি চোখ খুললাম। দেখলাম স্বামীজী। তিনি ইতিমধ্যে ঠাকুরের পুষ্পপাত্র হাতে নিয়ে পূজার আসন থেকে উঠে পড়েছেন। ঠাকুরকে ফুল নিবেদন না করে তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং ফুলে চন্দন মাখিয়ে আমাদের সকলের মাথায় একটা করে ফুল দিলেন।... প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের পূজা করেননি। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় একটা করে ফুল দিয়ে স্বামীজী বাস্তবিক প্রতি শিষ্যের ভিতর যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরাজমান, তাঁর পাদপদ্মে পুষ্প অর্পণ করেছিলেন। ঐভাবে তিনি আমাদের মধ্যে ঠাকুরকে উদ্বোধিত করেন। তাঁর আবির্ভাব আমাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। কারও ভক্তির প্রবণতা জেগেছিল, কারও মধ্যে জ্ঞানের ভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বামীজী পূজার মাধ্যমে আমাদের দেবত্ব বিকশিত করে দিয়েছিলেন। পুষ্পপাত্রের বাকি ফুলগুলি উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়নি। কারণ, বেদিতে ঠাকুরের ছবিতে স্বামীজী ঈশ্বরের যে আবির্ভাব দেখেছিলেন, ঠিক সেই একই ঈশ্বরের আবির্ভাব তিনি শিষ্যদের মধ্যেও দেখেছিলেন। তাই তিনি বাকি ফুলগুলি বেদিতে ঠাকুরকে নিবেদন করেন।''[১৩]

স্বামীজীকে পূজা করতে গেলে আগে মানুষ ভগবানের পূজা শিখতে হবে। দেবতার পূজা ভেদে যেমন ফুল ও পূজার সামগ্রী বিভিন্ন হয়, তেমনি স্বামীজী মানুষভেদে পূজার প্রণালী নির্দেশ করেছেন। যেমন ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্ন দিয়ে পূজা কর। অশিক্ষিতকে বিদ্যাদান, রোগীকে ঔষধপথ্য দান ও ধনীকে ধর্মদান করে পূজা কর। ১৮৯৭ সালে ক্ষেত্রীতে স্বামীজী কল্যাণদেবকে বলেছিলেন—''If you want to see God, go to the hut of the poor. And if you want to attain God, then serve the poor, the helpless, the downtrodden, and the miserable.''—তুমি যদি ঈশ্বরকে দেখতে চাও, তবে গরিবের কুটিরে যাও। আর যদি ঈশ্বরলাভ করতে চাও, তবে গরিব, অসহায়, পতিত ও দুঃখীদের সেবা করো।[১৪]

উপনিষদে আছে—মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব। স্বামীজী এর সঙ্গে যোগ করেছেন 'দরিদ্রদেবো ভব'। এই দরিদ্রনারায়ণের পূজাই বিবেকানন্দের পূজা। স্বামীজী তাঁর ভাবী কালের অনুরাগী ভক্তদের উদ্দেশে বলে গেছেন—''নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান—একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ। এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।''[১৫]

স্বামীজী সত্যিই একটি বিস্ময়। তিনি আনুষ্ঠানিক পূজায় বাধা দেননি। নিজে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজার প্রবর্তন করেছেন। বলেছেন—I have come to fulfil, not to destroy—আমি গড়তে এসেছি, ভাঙতে আসিনি। আবার বলছেন, ''যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট সর্বরূপী, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞেয় সত্য ও সর্বব্যাপীর উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।... হে মূর্খগণ, যে-সকল জীবন্ত নারায়ণে ও তাঁর অনন্ত প্রতিবিম্বে জগৎ পরিব্যাপ্ত, তাঁকে ছেড়ে তোমরা কাল্পনিক ছায়ার পিছনে

ছুটেছ। তাঁর—সেই প্রত্যক্ষ-দেবতারই—উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।"[১৬]

আমরা স্বামীজীর কথা ঠিক না বুঝে লাঠি নিয়ে এখন কি দেবদেউলে প্রতিমা ভাঙা শুরু করব? কখনওই নয়। যারা সবে ধর্মজীবন শুরু করেছে, তাদের জন্য প্রতিমা পূজা; আর যারা advanced আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে চান, তাদের জন্য পরাপূজা। স্বামীজী ছিলেন জগদ্গুরু—তাই তিনি সব মানুষেরই উপাস্য দেবতার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। পাঠশালার ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মধ্যে যেমন ভেদ, তেমনি উপাসকদের মধ্যেও ভেদ আছে। এম এ ক্লাসের ছাত্রদের কি পাঠশালাগুলো ভেঙে ফেলা উচিত?

বর্তমান যুগে স্বামীজী তাঁর গুরুপ্রদর্শিত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বা পূজার ওপর জোর দিয়েছেন। আমেরিকা থেকে একটা চিঠিতে গুরুভাইদের আনুষ্ঠানিক পূজাকে লক্ষ করে লিখেছেন : "আমরা কি সর্বত্যাগ করে সাণ্ডেলের (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল) জন্য ঘণ্টা বাজাতে এসেছি? স্যাণ্ডেল কাঁসারীপাড়ায় বাস করুক গে যদি ঘণ্টা নাড়া তার এতই ভাল লাগে।"

আমাদের কী করণীয়? ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব নিয়ে জীবনযাপন করবার চেষ্টা এবং সেগুলি কাজে লাগানো। স্বামীজী সিমলা পাড়ার ভাষায় ঠাট্টা করে এক শিষ্যকে বলেছিলেন : "আমি মরে গেলে তোরা যদি আমাকে অবতার বানিয়ে আমার ছবির সামনে খালি পিদ্দিম ঘুরুবি তো আমি ভূত হয়ে এসে তোদের ঘাড় মটকাবো।"[১৭]

অনন্ত কালের তুলনায় দেড়শো বছর কিছুই নয়। এ তো সবে শুরু। ভবিষ্যতে অগণিত মানুষ বিবেকানন্দের পূজা করবে। সত্যদ্রষ্টা ঋষি বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন : "দেখবি, দু-শ বছর পরে বিবেকানন্দের এক একটি চুলের জন্য লোক অস্থির হয়ে পড়বে।"[১৮]

স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য থেকে যেদিন বেলুড় মঠে এলেন তার পরদিন নাপিতকে ডাকতে বললেন। তাঁর মাথায় তখন দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি শোভা পাচ্ছিল। মঠবাড়ির পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে উঠানে বসে নাপিতকে তিনি হুকুম দিলেন, "দে, মাথাটা কামিয়ে দে।" মস্তক মুণ্ডন শেষ হওয়ার পর স্বামীজী ফিরে এসে দালানে ওঠার সময় দেখলেন, তাঁর ওই সুশোভন কেশরাশি—যা তাঁর মাথায় এতদিন শোভা পাচ্ছিল, তা সিঁড়ির পাশে নাপিত ফেলে দিয়েছে। দেখে হাসতে হাসতে বললেন, "চুলগুলো ফেলে দিলি, পরে দেখবি, বিবেকানন্দের একগাছা চুলের জন্য clamour (হইহই) লেগে যাবে!"[১৯]

মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্

শ্রীম বলতেন—ঠাকুরের প্রতিটি কথাই মন্ত্র। আর ওইসব মন্ত্রগুলির ভাষ্যকার হলেন স্বামীজী। তিনি নিজেই বলেছেন, আমার সব কথা ঠাকুরের কথারই প্রতিধ্বনি। স্বামীজী সাধনার দ্বারা মন্ত্রগুলিতে চৈতন্য এনেছেন—তাই তাঁর কথায় দারুণ শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যারাই স্বামীজীর বাণী শুনেছেন, সবাই একবাক্যে তা স্বীকার করেছেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন : "স্বামীজীর কথা শুনলে মরা মানুষ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বলত—'দাঁড়াও দাঁড়াও! মরে তো গেছি, কথাটা একবার শুনে যাই।' তাঁর কথার এতই জোর ছিল যে, ভাব ও ভাষা হৃদয়ের অন্তস্তলে তখনই পৌঁছত, একটুও বিলম্ব হতো না। সময়ের ভুল হয়ে যেত। লোকে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেত। সকলের মনকে এক উচ্চ ভাবভূমিতে তিনি তুলে দিতে পারতেন।"[২০] সিস্টার ক্রিস্টিন বলতেন, "স্বামীজীর শক্তি মানুষকে প্রচণ্ডরূপে অভিভূত করে ফেলত। তিনি ছিলেন বৈদ্যুতিক বাগ্মী।"

তাঁর কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে রোমাঁ্যা রোল্যাঁ লিখেছেন : ''তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল ভায়লনসেলো বাদ্যযন্ত্রের মতো (একথা আমি মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের মুখে শুনিয়াছি)। তাহাতে উত্থান-পতনের বৈপরীত্য ছিল না, ছিল গাম্ভীর্য, তবে তাহার ঝংকার সমগ্র সভাকক্ষে এবং সকল শ্রোতার হৃদয়ে ঝংকৃত হইত। তিনি তাঁহার শ্রোতার উপর একবার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলে, এই তীব্র ধ্বনিকে কর্ণ ভেদ করিয়া আত্মা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন। এমা কালভের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। এমা কালভে বলেন, তিনি ছিলেন চমৎকার 'ব্যারিটোন', তাঁহার গলার সুর ছিল চীনা গং-এর আওয়াজের মতো।"

মিসেস হ্যান্সব্রো বলেন, ''স্বামীজীর গলার স্বর ছিল baritone (গম্ভীর পুরুষালি সুর)—নিশ্চয়ই tenor (চড়ালুর)-এর চেয়ে bass (গুরুগম্ভীর, উদারা)-এর পর্দার দিকে। এরূপ সুরেলা কণ্ঠস্বর আমি কখনো শুনিনি। বক্তৃতার শেষে তিনি আবৃত্তি করতেন—'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং'। তাঁর বক্তৃতা শুনে সব মুগ্ধ হয়ে যেত।"[২১]

লিলিয়ান মন্টগোমারি বলেছেন : ''স্বামীজীর কণ্ঠস্বর ছিল স্পষ্ট ও মিষ্ট এবং গভীরভাবে অনুরণিত হত। তাঁর স্বর আসত শরীরের ঊর্ধ্বে কোন উচ্চ চৈতন্যের ভূমি থেকে। সেই বিশুদ্ধ দৈবী কণ্ঠস্বর মানবমনে প্রবেশ করে সব মলিনতা দূর করে দিত।"

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বামীজী খুব কম লোককে মন্ত্র দ্বারা দীক্ষিত করেছেন। ঠাকুরও খুব কম লোককে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা সাধারণ গুরু নন—যাঁরা কানে মন্ত্র দিয়ে দীক্ষা দেন। ঠাকুর ও স্বামীজী অনেক লোককে শাম্ভবী ও শাক্তী দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিপাত বা স্পর্শ অপরের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করত। তন্ত্রমতে শক্তিই মন্ত্র। সমস্ত ভাবের মনন এবং সমস্ত সংস্কার হতে ত্রাণ করার সামর্থ্যবশত এই মনন-ত্রাণরূপিণী শক্তিকে মন্ত্র বলা হয়।[২২]

প্রিয়নাথ সিংহ ছিলেন স্বামীজীর বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। তাঁর স্মৃতিকথা :

''একদিন স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে আছেন, আমি তাঁকে দর্শন করতে গেছি। তাঁর সঙ্গে আমেরিকার ও জাপানের অনেক কথা হবার পর, আমি জিজ্ঞাসা করলুম—

প্রশ্ন। স্বামীজী, আমেরিকায় কতগুলো শিষ্য করেছ?

স্বামীজী। অনেক।

প্রশ্ন। ২/৪ হাজার?

স্বামীজী। ঢের বেশি।

প্রশ্ন। কি, সব মন্ত্রশিষ্য?

স্বামীজী। হ্যাঁ।

প্রশ্ন। কি মন্ত্র দিলে স্বামীজী, সব প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছ?

স্বামীজী। সকলকে প্রণবযুক্ত দিয়েছি।

প্রশ্ন। লোকে বলে, শূদ্রের প্রণবে অধিকার নেই, তায় তারা ম্লেচ্ছ; তাদের প্রণব কেমন করে দিলে? প্রণব তো ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারো উচ্চারণে অধিকার নেই?

স্বামীজী। যাদের মন্ত্র দিয়েছি, তারা যে ব্রাহ্মণ নয়, তা তুই কেমন করে জানলি?

প্রশ্ন। ভারত ছাড়া সব তো যবন ও ম্লেচ্ছর দেশ, তাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ কোথায়?

স্বামীজী। আমি যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও-কথা ঠিক, ব্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই। হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে অঘোর চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে। মাথায় করে গুয়ের হাঁড়ি নে যায়। সেও তো বামুনের ছেলে।

প্রশ্ন। ভাই, তুমি আমেরিকা-ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ কোথায় পেলে?

স্বামীজী। ব্রাহ্মণজাতি আর ব্রাহ্মণের গুণ দুটো

আলাদা জিনিস। এখানে সব—জাতিতে ব্রাহ্মণ, সেখানে গুণে। যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিনটে গুণ আছে জানিস, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলে গণ্য হবার গুণও আছে। এই তোদের দেশে ক্ষত্রিয়-গুণটা যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি ব্রাহ্মণ-গুণটাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব পাচ্ছে।"[২৩]

একদিন জনৈক ব্যক্তি স্বামী শুদ্ধানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, দীক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর কি মত ছিল?"

স্বামী শুদ্ধানন্দ : "স্বামীজীর দীক্ষার উপর বিশেষ ঝোঁক ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল সন্ন্যাস। তিনি বলতেন, 'হাজার হাজার ছেলে আসবে, আমি তাদের একধার থেকে মাথা মুড়িয়ে দেব, আর তাদের বাপেরা এসে কাঁদবে, আমি দেখব।' মাথা মুড়িয়ে দেওয়া মানে সন্ন্যাস দেওয়া আর কি!"[২৪]

ঠিক চৌষট্টি বছর আগে ১৯৪৯ সালে আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি, তখন আমাদের বাংলা পুস্তকখানির নাম ছিল—'সাহিত্যচয়ন'। উহার প্রথম প্রবন্ধটির নাম ছিল 'স্বদেশমন্ত্র'—রচয়িতা স্বামী বিবেকানন্দ। তখন পড়ি স্বামীজীর জাতি জাগরণের দীক্ষামন্ত্র : "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর। ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র। ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

আমাদের স্বভাব ভুলে যাওয়া, কারণ আমাদের মস্তিষ্ক দুর্বল। তাই স্বামীজী আমাদের উদ্দেশে ছবার বললেন—'ভুলিও না'। তারপর দীক্ষিতদের স্বামীজী সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করালেন : "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

এভাবে মাতৃভূমিকে ও সমগ্র জাতিকে কেউ ভালোবেসেছেন কি না জানি না।

তারপর দীক্ষান্তে দীক্ষার্থীকে প্রার্থনা শেখালেন : "বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

নিবেদিতা স্বামীজীর এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে লিখেছেন : "দেখিতাম, ভারতের চিন্তা তাঁহার নিকট শ্বাসপ্রশ্বাসস্বরূপ।... তিনি বলিতেন, তাঁহার কাজ হইল 'মানুষ তৈরি করা।' কিন্তু প্রেমিকের হৃদয় লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তাঁহার আরাধ্য দেবতা ছিলেন জননী জন্মভূমি।"[২৫]

দীক্ষার পর গুরুকে দক্ষিণা দেওয়ার রীতি আছে। স্বামীজী আমাদের কাছে দক্ষিণা চাইলেন : "হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচার নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক; মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক; তোমাদের পাগল হবার উপক্রম হউক! আমি তোমাদের নিকট এই গরীব অজ্ঞ, অত্যাচার পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।" এদের সেবা করতে পারলেই আমাদের স্বামীজীকে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে।

স্বামীজীর স্থূল মূর্তি আমাদের সামনে নেই, কিন্তু তাঁর বাণীমূর্তি আমাদের সামনে দেদীপ্যমান। তাঁর বক্তৃতা, চিঠি, কবিতা, কথোপকথনের মধ্যে স্বামীজী জীবন্তরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। ক্রিস্টোফার ইশারউড হলিউড আশ্রমে কোনও কোনও রবিবার স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রোতাদের সামনে পাঠ করতেন। তিনি পরে 'বেদান্ত ও মুক্তির বাণী' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় নিজের অভিজ্ঞতা লেখেন : ''বিবেকানন্দের বাণীর পশ্চাতে প্রায়ই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সাক্ষাৎ উপস্থিতি। যাঁরা স্বামীজীর বাণী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেছেন তাঁদের সকলেরই মত আমিও যে নিঃসন্দেহে শ্রোতাদের সঙ্গে একযোগে স্বামীজীর উপস্থিতি অনুভব করেছি, আমি তা প্রায়ই বোধ করেছি। এমন কি, আপনারাও, নিজগৃহে স্বামীজীর বাণী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করলে আপনাদেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হতে পারে।''

মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা

কৃপা চারপ্রকার—আত্মকৃপা, শাস্ত্রকৃপা, গুরুকৃপা ও ঈশ্বরকৃপা। সাধকের স্বপ্রযত্নই 'আত্মকৃপা'। কথায় বলে—'গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া হলো, একের দয়া বিনা জীব ছারখারে গেল।'' এই একের দয়া হল মানুষের নিজের চেষ্টা—উহাই আত্মকৃপা। শ্রদ্ধা-বীর্য-প্রেম প্রভৃতি গুণ পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হলে শাস্ত্রের মর্ম মুমুক্ষুর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ইহাই শাস্ত্রকৃপা। সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা প্রসন্ন হয়ে গুরু শিষ্যকে তত্ত্ব উপদেশ দেন। একে বলে গুরুকৃপা। আত্মকৃপা হলে ঈশ্বরেরও কৃপা হয়। ঈশ্বর কৃপার জন্য প্রয়োজন নিরভিমানিতা, সাধন ভজন ও ব্যাকুলতা। ঈশ্বর ও গুরু সদাকৃপাময়।

স্বামীজীর শিষ্য মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি : ''একবার স্বামীজীকে প্রশ্ন করলাম, 'মুক্তি কি গুরু দেন, না জীব সাধনাবলে মুক্তিলাভ করে?'

স্বামীজী। জীব নিজের ইচ্ছায় বদ্ধ হয়েছে। বদ্ধ হয়েছে বলেই তো সে জীব। অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা থেকে সে নিজেই ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ব্যষ্টিত্ব লাভ করেছে এবং সেই থেকে নিজেকে আলাদা বলে ভাবছে। কেন এমন হলো? এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। যদি বল কোন শক্তির দ্বারা হয়েছে, জীবের নিজের ইচ্ছায় হয়নি, তাহলে সেই শক্তির নাম হলো মায়া। মায়ার প্রভাবে জীব নিজের আলাদা অস্তিত্ব বোধ করে। মায়ার যে শক্তি, তার অনন্ত ধারা। জীবের ক্ষুদ্র শক্তি তার কাছে থাকবে জলবিন্দুর মতো। জীব একা একা কি করবে? তাই মায়াশক্তির সঙ্গে সে খেলে, খেলতে খেলতে ভুলে যায় কোথা থেকে সে এসেছে। প্রকৃতির ফাঁদে পড়ে ব্রহ্ম (জীব) তখন কাঁদে।

ছোট ছেলেদের দেখেছিস? একটা থাম ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে। জীবও ওই রকম নিজের বাসনা-বলে হাবুডুবু খাচ্ছে আর বলছে, 'বাঁচাও।' ছোট ছেলে যদি বলে, 'আমার হাত খুলে দাও!' বড়রা কি করে? হাসে, আর এই তামাসা দেখে। মায়ার শক্তি আশ্রয় করেই জীব ভোগ করে আর তাকেই বলে, 'দূর হ!' ঈশ্বর তখন সেই জীবকে উদ্ধার করতে ছুটে আসবেন? না, মজা দেখবেন? ছোট ছেলে হাত খুলে নেয়, যখন ঘুরপাক খাওয়ার ইচ্ছা তার শেষ হয়। জীবের মুক্তিও নির্ভর করে বাসনা-ত্যাগে। বাসনা ত্যাগ করার ইচ্ছা হলে তখন মুক্তির কথা। ত্যাগ হয়ে গেলেই মুক্তি।

আমি। তাহলে গুরু কি করেন? কৃপা আমরা চাই-ই বা কেন?

স্বামীজী। জীব নিজে পথ দেখতে পায় না, হাতড়াচ্ছে কীসে উদ্ধার হবে। তখন এমন একজনকে আশ্রয় করে, যাঁর ও পথঘাট জানা আছে। তিনি একটা রাস্তা ধরিয়ে দেন। সেইভাবে সাধনা করলে সে মুক্তির পথ খুঁজে পায়। এটা গুরুকৃপা ছাড়া কি?[২৬]

অনেকে কৃপার প্রত্যাশী হয়ে বসে থাকে। তারা

বোঝে না যে কৃপা গাছ থেকে পড়ে না। স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের বলতেন, ‘‘... তাঁর কৃপা পেতে হলে আগে শুদ্ধ পবিত্র হওয়া চাই; কায়মনোবাক্যে পবিত্র হওয়া চাই, তবেই তাঁর কৃপা হয়।”

শিষ্য—কিন্তু কায়মনোবাক্যে সংযম করিতে পারিলে, কৃপার আর দরকার কি? তাহা হইলে তো আমি নিজেই নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করিলাম।

স্বামীজী—তুই প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছিস দেখে তবে তাঁর কৃপা হয়। Struggle না করে বসে থাক, দেখবি কখনো কৃপা হবে না।”[২৭]

স্বামীজী ছিলেন নিত্যমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। তিনি তাঁর শিষ্যদের ব্যক্তিগত মুক্তির চেষ্টা ছেড়ে পরার্থে জীবনদানের জন্য উৎসাহ দিতেন। বলতেন, ‘‘জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা।... মুক্তিকামনাও তো মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান, ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি। আমি যে কাজে লেগেছি সেই কাজে লেগে যা।”[২৮]

সিদ্ধ গুরু স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের অভয় দিয়েছেন। তিনি একদিন স্বরূপানন্দ স্বামীকে বলেন, ‘‘দেখ স্বরূপ, আমি যার মাথায় হাত বুলিয়েছি, তার কোন ভাবনা নেই। এ নিশ্চিত জানবি।”[২৯] আর একদিন স্বামী সদানন্দের কথা উঠলে স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে বলেন, ‘‘আমার চেলারা যদি হাজার বার নরকে যায়, তাহলে আমি হাজার বার তাদের হাত ধরে তুলব। এ যদি সত্য না হয়, তবে ঠাকুরাদি সব মিথ্যা জানবি।”[৩০] কেবলমাত্র সদ্‌গুরুই এরূপ ভরসা দিতে পারেন।

স্বামীজীর গুরুভাব শিষ্যদের মনে অনেক সময় বিস্ময় সৃষ্টি করত। স্বামীজীর একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব ছিল। তাঁর দিব্য প্রভাবে তাঁর অন্তরঙ্গদের মহান দেখাত। তিনি কাউকে হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে, কাউকে দৃষ্টির দ্বারা, আবার কাউকে বকুনির দ্বারা শক্তি সঞ্চার করতেন। যাঁরা তাঁর আধ্যাত্মিক বলয়ের মধ্যে এসেছে, তারাই স্বামীজীর কৃপালাভে ধন্য হয়েছে।

১৯০০ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে স্বামীজী মিসেস হ্যান্সব্রোকে লক্ষ করে ঠাকুরের দুটি গল্প বলেন, সেগুলি তিনি স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন : ‘‘প্রথম গল্পটি হলো—এক বৃদ্ধা জলদৈত্য একটি পুকুরে বাস করত। তার চুলগুলি ছিল খুব লম্বা এবং সে ইচ্ছামতো সেই চুল বাড়াতে পারতো। কেউ যখন পুকুরে স্নান করতে আসত, সেই জলদৈত্য ক্ষুধার্ত হলে তাকে খেয়ে ফেলত। আর অপরদের সে এক একটা চুলের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের পায়ের আঙুলে বেঁধে রাখত। তারা যখন স্নান করে বাড়ি যেত, সেই অদৃশ্য চুল ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে তাদের সঙ্গে যেত। সেই বৃদ্ধা জলদৈত্য যখন ক্ষুধার্ত হতো, সে তার একটা চুল ধরে টানতে শুরু করত—যতক্ষণ না সেই ব্যক্তিটি পুকুরে আসে। তারপর ঐ ব্যক্তিটিকে সে খেয়ে ফেলত।

‘‘স্বামীজী শেষে আমাকে বলেছিলেন, ‘আপনি সেই পুকুরে স্নান করেছেন, যেখানে আমার জগন্মাতা বাস করেন। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, বাড়ি যেতে পারেন, কিন্তু মায়ের চুল আপনার পায়ের আঙুলে বাঁধা আছে। পরিশেষে আপনাকে আবার এই পুকুরে আসতে হবে।’ ”

‘‘অপর গল্পটি ছিল—একবার একটি লোক একটা ছোট নদী হেঁটে পার হচ্ছিল—হঠাৎ তাকে সাপে কামড়াল। সে তাকিয়ে দেখে মনে করল, ওটি একটি বিষহীন জলের সাপ (water snake) এবং সে নিরাপদ। আসলে ওইটি ছিল একটি বিষাক্ত কেউটে। স্বামীজী তারপর আমাকে বললেন, ‘আপনি কেউটে সাপের দ্বারা দংশিত হয়েছেন। কখনো মনে করবেন না যে, আপনি এর থেকে ছাড়া পাবেন।’ ”[৩১]

স্বামীজীর গুরুভাব ও কৃপা কি সেই মুষ্টিমেয় শিষ্যদের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে? কখনই নয়। তিনি ছিলেন কালজয়ী পুরুষ। পরবর্তী কালে পৃথিবীর অগণিত নরনারী স্বামীজীর ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে

তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেছে, এখনও করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। প্রকৃত গুরু ঈশ্বর। তাঁর শক্তি বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষদের ভিতর দিয়ে অপরের মধ্যে সংক্রামিত হয়।

দেহত্যাগের এক সপ্তাহ আগে স্বামীজী তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, ‘‘শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর পরহিতায় জীবন পাত কর—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।’’

হে পাঠকবর্গ, আসুন—আমরা সকলে স্বামীজীর এই শুভ ১৫০তম জন্মলগ্নে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করি, যেন তাঁর সেই অপূর্ব অমোঘ আশীর্বাদ আমাদের উপর সতত বর্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র

১। স্বামী নির্লেপানন্দ, *রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৩৪), পৃঃ ১১৯-১২০
২। স্বামী চেতনানন্দ, *বহুরূপে বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় , ২০১১), পৃঃ ১৮৬
৩। *রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে*, পৃঃ ১১৫
৪। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী*, (দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি : কলকাতা, ২০০৭) খণ্ড ১, পৃঃ ১৭৩-৭৫
৫। *স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি*, পৃঃ ২১০
৬। *Prabuddha Bharata*, Nov. 1936
৭। *Vedanta and the West*, No. 160, p. 56
৮। রোমাঁ রোলাঁ, *বিবেকানন্দের জীবন*, অনুবাদ : ঋষি দাস (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি : কলকাতা, ১৯৬৯), পৃঃ ২-৩
৯। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, খণ্ড ১০ (২০০১), পৃঃ ১৮২
১০। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১১), পৃঃ ১১২
১১। সম্পা. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯১), পৃঃ ৬২
১২। তদেব, পৃঃ ৬২
১৩। *বহুরূপে বিবেকানন্দ*, পৃঃ ৩৫৫-৫৬
১৪। *Prabuddha Bharata*, May, 2005, p. 287
১৫। *স্বামীজীর বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৭ (১৯৯৯), পৃঃ ২৮০
১৬। তদেব
১৭। *জীবনালোকে*, পৃঃ ২২৫
১৮। *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ৬২
১৯। সম্পা. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *যুগদিশারী বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), পৃঃ ৩৪০
২০। *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ১০
২১। *বহুরূপে বিবেকানন্দ*, পৃঃ ১৪৫
২২। গোপীনাথ কবিরাজ, *তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত* (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় : বর্ধমান, ১৯৬৯), পৃঃ ২২৪
২৩। *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ১৪৯-৫০
২৪। *উদ্বোধন*, ৫৪ বর্ষ, সংখ্যা ১২
২৫। *স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি*, পৃঃ ৩০
২৬। *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ১২০-২১
২৭। *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, পৃঃ ১৫৭-৫৮
২৮। *তদেব*, পৃঃ ১৪৫
২৯। *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ৬২
৩০। *তদেব*
৩১। *বহুরূপে বিবেকানন্দ*, পৃঃ ১৭৯

এই প্রবন্ধটি অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল থেকে প্রকাশিত ‘বিবেক-জীবন’ পত্রিকার জানুয়ারি ২০১৩ সংখ্যায় মুদ্রিত প্রবন্ধের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ।